অন্য কেউ

আহসান হাবীব

BANGLAPDF.NET PRESENTS

বইয়ের পোকা

www.facebook.com/groups/we.are.bookworms

একটি বইয়ের পোকা ♦ (The INSECT of books) পরিবেশনা।

অন্য কেউ

আহসান হাবীব

PDF CREATED BY-

BIRONJEET ROY

WEBSITE-banglapdf.net

GROUP-

বইয়ের পোকা ♦ (The INSECT of books)

&

BanglaPDF.net

(বাংলাপিডিএফ.নেট)

বাচ্চাটার বয়স কত হবে? সাত-আট। টিংটিঙে শরীর। খালি গা একটা ইলাস্টিক লাগানো রং ওঠা প্যান্ট। ইলাস্টিকটা ঢিলে হয়ে গেছে বলে প্যান্টটা মাঝে মাঝে হাঁটু পর্যন্ত নেমে আসছে। সে টেনে টেনে তুলছে একটু পর পর। মাথা ভরতি অযত্নে লালচে হয়ে ওঠা কোঁকড়া চুল। মাঝে মাঝেই সে গোবিন্দপুরের বিখ্যাত জিনের হ্রদের ঢিবিটার ওপর দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকায় তখন সবাই অবাক হয়।

—পোলাডা ওইখানে খাড়ায়া কী দেখে?

—পোলাডা গাধা কিসিমের!

—ক্যান?

—এই জিনের হ্রদে আইসা সবাই নিচমুখি চায়, বিষয়ডা বোঝার চেষ্টা করে আর ওই গাধার কাণ্ড দেখ, হে চায় ওপর মুখি। আকাশ দেখে... আকাশে আছেডা কী?

—আছে আছে... বদি মাস্টার বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ে। আমগো সালু দেখবা একদিন অনেক বড় দার্শনিক হইব...

—দার্শনিক কী?

বদি মাস্টার ওদের কথার উত্তর দেয় না। সালুকে খেয়াল করে। সালু তখনো কোমরে হাত দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে, কী দেখে ছেলেটা? মেঘ দেখে? মেঘের আড়ালে লুকিয়ে পড়া সূর্যটাকে দেখে? নাকি মেঘের সিমুলাক্রা দেখে?

বদি মাস্টার নিজেও আকাশের দিকে তাকায়। সাদা মেঘগুলো অদ্ভুত সব অবয়ব তৈরি করে ভেসে যাচ্ছে। ছেলেটাকে স্কুলে ঢুকাতে পারলে হতো। কিন্তু হেড স্যার বাচ্চাটাকে নিতে চায় না। লোকটা বদ। শিকদার মোড়লের আত্মীয়। মাঝে মাঝে বদি মাস্টারের ইচ্ছা করে স্কুলটা ছেড়ে দিতে। অন্য কোনো স্কুলে ঢুকতে। কিন্তু নিজের খোঁড়া পা টার জন্য ঠিক ভরসা পায় না। এই বরং ভালো বাড়ির কাছের স্কুল। তবে একটা কিছু তাকে করতেই হবে। বদি মাস্টার তার পরিকল্পনাটা নিয়ে ভাবে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় সালুর দিকে। সালু তখনো আকাশের দিকে তাকিয়ে... কপালে নেমে আসা তার ঝাঁকড়া-কোঁকড়া চুলের আড়ালে চোখ দুটো রোদের কারণে কুঁচকে আছে।

—এই সালু। বদি মাস্টার ডাকে সালুকে

—জে। ঢিবির ওপর থেকে দাঁড়িয়ে চেঁচায় সালু।

—এদিক আয়।

সালু লাফ দিয়ে নামে ঢিবি থেকে। তারপর এক ছুটে এসে দাঁড়ায় বদি মাস্টারের সামনে। তার টিংটিঙে চিকন দুটি পায়ে দৌড়ানোর ভঙ্গিটাও অদ্ভুত।

—আমারে ডাকছুইন?

—হ্যাঁ।

—কইন।

—তোরে অ আ বই দিছিলাম পড়িস?

—নাহ

—কেন?

—রাইতে ঘরে বাত্তি থাকে না আর দিনে কত কাম করতে হয়।

—ওহ আমার কামের মানুষটা আইছে। পাশ থেকে একজন মন্তব্য করে।

—ক্যান তোর বইনে পড়ায় না?

—নাহ, হেতো কত বাড়িত ধান ভানে, বেয়ানে যায় সইন্ধারাইতে আমার লাইগা ভাত নিয়া আসে

—হুম... বদি মাস্টার থেমে যায়।

—এই ছেমড়া তুই ওইখানে খাড়ায়া আকাশমুখি কী দেখস? নিচমুখি দেখস না কেন? অভিযোগের ভঙ্গিতে বুড়োমতো একজন বলে। তারা সবাই জিনের হ্রদে বিকালের দিকে ঘুরতে আসে। তারাই আসে যারা এর আশেপাশেই থাকে—কাম-কাজহীন অফুরন্ত অবসরের গ্রামের কিছু মানুষ।

—নিচেতো দেখছি...

—কী? কী দেখছস?

—জিনের রদ।

—ওইতো... ওইখানে কী?

—ওইখানে অনেক গর্ত... নিচে নদী... হেই নদী গেছে... সমুদ্দুরে...

—হ তরে কইছে... দু-চারজন সালুর কথা বলার ঢঙে হেসে ওঠে। তারপর স্নেহের সুরে বলে, যা যা খেলাগা...

সালু অবশ্য খেলতে যায় না। আবার লাফ দিয়ে উঠে জিনের হ্রদের ওপর। যেন এটাই তার একটা খেলা। বদি মাস্টার মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে পাগলা ছেলেটার দিকে। তার পরিকল্পনাটা নিয়ে ভাবে। এই ছেলেটাই তার ভরসা, একে দিয়েই শুরু করতে হবে।

গোবিন্দপুর গ্রামটা খুব সাধারণ একটা গ্রাম। সীমান্তের খুব কাছে বলে এখানকার বাজারে গেলে ভারতীয় জিনিসপত্র বেশ দেখা যায়। তবে এখানে একটা প্রাকৃতিক গভীর হ্রদ আছে। গ্রামের লোক বলে 'জিনের হদ' আসলে শব্দটা হবে জিনের হ্রদ। কিংবা হওয়া উচিত্ ছিল শুধু হ্রদ। কিংবা গোবিন্দ হ্রদ বা গোবিন্দপুর হ্রদ খুব সাধারণ একটা প্রাকৃতিক সৃষ্টি। বিষয়টা এলাকার একমাত্র স্কুলের ভূগোল শিক্ষক বদি মাস্টর জানেন। তিনি অনেককেই এর ব্যাখ্যা দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, লাভ হয়নি। গ্রামের সাধারণ মানুষ তার কথায় গুরুত্ব দেয়নি। তারা জানে, এটা জিনের বাদশার তৈরি একটা হদ... মানে হ্রদ। কোহকাফ নগরীতে থাকেন এক জিনের বাদশাহ যার বয়স পাঁচ হাজার বছরের ওপরে। তার সরাসরি নির্দেশে ওই হ্রদ তৈরি হয়েছে। এই হ্রদের পানি খেলে নাকি যেকোনো বালা-মুসিবত দূর হয়ে যায়। তবে

এখন পর্যন্ত কাউকে ওই হ্রদে নেমে পানি সংগ্রহ করতে দেখা যায়নি। বাইরে থেকে উঁকি মারলেও ভেতরে নেমে কখনো এর সত্যতা পরীক্ষা করার প্রয়োজন বোধ করেনি গ্রামবাসী। কে জানে হয়তো ভয়েই.. তারা ভেতরে নামে না। অনেকের ধারণা, ভেতরে নামলে কোহকাফ নগরের জিনের বাদশা তার পাইক-পেয়াদা দিয়ে টান মেরে পানির গভীরে নিয়ে যায়, তারপর আর তাদের কখনো দেখা যায় না।

বছর পাঁচেক আগে আদনান শাফি যখন বিদেশে ছিল তখন তার ইতালিয়ান বন্ধু য়ুহান ক্রাইফ একবার জিজ্ঞেস করেছিল—

—হাউ ইজ ইওর কান্ট্রি?

—আদনান চোখ বন্ধ করে বলেছিল, ইটস গ্রিন...

—রিয়েলি? অবাক হওয়ার একটি ভঙ্গি করেছিল য়ুহান।

আজ গোবিন্দপুর গ্রামে এসে আদনানের মনে হচ্ছে, বাংলাদেশের গ্রামগুলো কি সত্যিই গ্রিন? নাকি গ্রে?... ধূসর। ধুলোধূসরিত বাংলাদেশের গ্রাম, হয়তো সবুজই, ধুলোয় আচ্ছন্ন হয়ে আছে, বর্ষাকালে কি ঝক ঝক করে ওঠে সবুজ?। তবে গোবিন্দপুর গ্রাম বাংলাদেশের আর দশটা গ্রামের মতোই সাধারণ একটি গ্রাম। কিন্তু গ্রামের বাজারটা জমজমাট। হয়তো হাটবার বলে। আদনান শাফির বাজারটায় এসে ভালো লাগছে। চারদিকে খোলামেলা একটা বাজার। তার দিকে অনেকেই ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছে তার পোশাক-

আশাক শহুরে বলে? কিংবা অচেনা মুখ দেখে হয়তো কৌতূহল। কেউ কেউ সাহস করে জিজ্ঞেস করছে—

—মিয়াসাবের বাড়ি?

—ঢাকা।

—কই আইছুইন?

—এইতো মৌলবি বাড়িতে বেড়াতে এসেছি।

—এরশাদগো বাড়ি?

—হু।

—এরশাদ মিয়া আপনার কে হয়?

—আমার বন্ধুর চাচা।

—হেয়তো গত বছর মারা গেছে।

—হ্যাঁ শুনেছি।

—ভালো মানুষ ছিল। সাপের কামড়ে মরছে। গোক্ষুর সাপ।

লোকটা সেই সাপের বর্ণনা দিতে শুরু করে। আদনান অবশ্য শোনে না, এগিয়ে যায় মাছের বাজারের দিকে। ছোট বড় নানান বাঁশের ডালায় করে

মাছ বিক্রি হচ্ছে। ঢাকার বরফ দেয়া শক্ত মাছ না। সতেজ মাছ। বেশ বড় একটা বোয়াল মাছের পাশে ধরফর করে লাফাচ্ছে একটা নাম না জানা মাছ। কী মাছ এটা কে জানে। এক জায়গায় কই মাছ বিক্রি হচ্ছে, চাষের মাছ না। দেশি কই বোঝাই যাচ্ছে। কই আদনানের পছন্দের মাছ। কিনবে নাকি? হবীব মাইন্ড করতে পারে। তার গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে এসে সে-ই মাছ কিনে ফেলছে বিষয়টা তার এরশাদ চাচার স্ত্রী পছন্দ না-ও করতে পারেন। মহিলাকে এখন পর্যন্ত দেখেনি আদনান, ওদের সংসার নাকি নেপথ্যে তিনিই চালাচ্ছেন। পছন্দ করবে না হয়তো। তা হোক, কেনা যাক না। আফটার অল দেশি কই ঢাকার স্বাদহীন থাইল্যান্ডের কই নয়।

—কই কত?

—কেজি আশি টাকা, আপনের লাইগা সত্তর।

—আমার জন্য দশ টাকা কম কেন?

—আপনি বিদেশ্যা লোক দেইখাই বুজছি।

—আচ্ছা... দেন এক কেজি দেন।

—দুই কেজি দেই?... ভালো মাছ, আপনেগো শহরে এই জিনিস নাই।

—আচ্ছা দেন।

দুই-তিনজন ভিড় করে দেখে আদনানের এক সঙ্গে দুই কেজি মাছ কেনা, এখানে এক সঙ্গে দুই কেজি মাছ কেনা হয়তো বড়লোকি, কে জানে! হঠাত্ একটা বাচ্চা ছেলের মাথা দেখা যায়, চোখ দুটো বড় বড় হাড়-জিরজিরে শরীর খালি গা প্যান্টটা ছেঁড়া, হাঁটুর কাছে ঝুলে পড়েছে। মাথা ভরতি লালচে কোঁকড়া চুল তার ছোট্ট কপালটা ঢেকে রেখেছে। ছেলেটা তার দিকে উৎসাহ নিয়ে তাকায়—

—মাছ কাটবাইন?

—তুমি মাছ কাট নাকি? হাসি মুখে তাকায় আদনান।

—আমার বইনে কাডে... কেজিতে দশ ট্যাকা... কাটবাইন? ছেলেটির আগ্রহী চোখ আদনানের উত্তরের অপেক্ষায়। যেন আদনান যদি না বলে তাহলে তার সর্বনাশ হয়ে যাবে। আদনান মাথা নাড়ে। সে মাছ কাটবে। ছেলেটি মাছওলাকে বলে, গুইনা দেইন... স্যারে মাছ কাটাইব।

মাছওলা মাছ গুনে দেয় একুশটা কই। ছেলেটি পলিথিনের দুই প্যাকেটে একুশটা মাছ নিয়ে ছুটতে ছুটতে আদনানকে বলে, আপনে এই বেঞ্চিটায় বউহাইন...

এই এলাকার ভাষায় ময়মনসিংহের টান আছে। বাচ্চাটার গলায় সেই সুরটা পায় আদনান। ভাষাটা আন্তরিক। শুনতে ভালো লাগে। বাজারের সাইডে একটা বিশাল গাছ। তার নিচে বাঁশ দিয়ে তৈরি একটা বেঞ্চ। মানুষ বসতে

বসতে বাঁশগুলো অসাধারণ পিচ্ছিল হয়ে গেছে। আদনান বসে, এক বুড়ো বসে আছে আগে থেকেই। যথারীতি আদনানকে প্রশ্ন করে—

—মিয়া সাবের বাড়ি?

—ঢাকা।

—কার বাড়িত আইছুইন?

—মৌলবি বাড়ি।

—এরশাদ মিয়ার... হেতো সাপের কামড়ে মরছে... গত বছর...

আফসোসের ভঙ্গিতে বুড়ো মাথা নাড়ে। বিড়বিড় করে আরো কিসব বলে। আদনান তার কথা শুনছে—এমন ভঙ্গি করে একটা সিগারেট ধরায়। বাজারটা দেখতে দেখতে হালকা হয়ে আসছে। ঘড়িতে চারটার ওপরে বাজে। ঢাকা থেকে হবীবদের গ্রামের বাড়ি এসেছে আদনান আজ দ্বিতীয় দিন, স্রেফ বেড়াতে। এসেই হবীব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এক শ তিনের ওপর জ্বর। তাই আদনানকে একা একা ঘুরতে হচ্ছে। আজ এসেছে বাজারে। বাজারটা সুন্দর, পাশেই একটা খাল। খালের ওপর দিয়ে বাঁশের একটা চিকন সাঁকো। ছোট ছোট নৌকাও চলছে নিচ দিয়ে। নৌকাভরতি পাট। এখানে কি পাঠ ভালো হয় কে জানে!

—স্যার, আর তিনডা মাছ আছে।

আদনান সকৌতুকে তাকায় বাচ্চাটির দিকে। সে রিপোর্ট করতে এসেছে মাছ কাটার সর্বশেষ পরিস্থিতি। বাচ্চাটা চঞ্চল টাইপের। তাকে খুব অস্থির দেখাচ্ছে...

—আচ্ছা, তোমার বোন কোথায় মাছ কাটছে?

—হেইযে বেড়াডা তার হেই পাশে।

—তুমি তোমার বোনের সাথে থাক?

—জে।

—তোমার নাম কী?

—সালু।

—খালি গা কেন? শার্ট কই?

—শার্ট কী? অবাক হয় বাচ্চাটি। আরো অবাক হয় আদনান, বাচ্চাটা শার্ট কী জানে না।

—গায়ে কাপড় কই? খালি গা কেন তোমার ? আবার বলে আদনান।

—ও পিরান? নাই। বইনে কইছে হেই বৈশাখ মাসে কিইনা দিব। আদনানের মনটা খারাপ হয়ে যায়। এত একটা ছোট বাচ্চা তার একটা শার্ট নেই! খালি গায়ে থাকে।

বাচ্চাটি ফের ছুটে যায়। একটু পরেই ছুটে আসে। দুই হাতে দুই পোটলা কাটা কই মাছ।

—শ্যাষ...

বিশ টাকার জায়গায় ত্রিশ টাকা দেয় আদনান, বিশ টাকা তোমার বোনের মাছ কাটার জন্য আর দশ টাকা তোমার।

—আমার? বাচ্চাটা যেন একটু বিস্মিত হয়।

—হ্যাঁ তোমার। নাম কী যেন বললে তোমার?

—সালু।

—হ্যাঁ হ্যাঁ সালু। বাহ সুন্দর নাম। সালু তার নামের প্রশংসা শোনার জন্য আর দাঁড়ায় না। হঠাত্ টাকাটা পতাকার মতো উঁচু করে ধরে একটা লাফ দিয়ে দৌড় দেয়।

আদনান হাঁটা দেয় বাড়ির দিকে। বিকেল হয়ে গেছে। দ্রুত পা চালায় আদনান, রাস্তা চিনে যেতে পারবেতো সে? রিকশা নেয়া যায়। এখানে একটা-দুটো রিকশা চলে কিন্তু আদনান হাঁটতে শুরু করল। গ্রামের মেঠো পথ ধরে একা একা হাঁটতে হাঁটতে আদনানের মনে হয়, এই সহজ-সরল গ্রামটায় থেকে গেলে কেমন হয়? বিদেশে ছিল সে বেশ ক বছর। মোটেই ভালো লাগেনি। প্রজেক্ট শেষ হওয়া মাত্র চলে এসেছে। ওরা প্রজেক্টটা বাড়াতে আগ্রহী ছিল। ওদের গুমোট আবহাওয়াটাই মন খারাপ করে দেয়।

আর আমার দেশটা কী উজ্জ্বল একটা দেশ, রোদ যখন ওঠে কী তীব্র ঝলমলে রোদ। বর্ষায় আকাশ উপুর করা বৃষ্টি, সবুজ হয়ে ওঠে বাংলাদেশ...।

—তুই মাছ কিনেছিস শখ করে ঠিক আছে, কিন্তু কাটিয়ে আনার কী দরকার ছিল? বাড়িতে কি মাছ কাটার লোক ছিল না?

—আসলে কাটাতাম না, একটা ছোট্ট বাচ্চা ধরল কাটার জন্য , মায়া লাগল বাচ্চাটাকে দেখে তাই...

—বলিস কী! আমাদের গ্রামের বাজারতো দেখি অনেক উন্নত হয়েছে.. মাছ কাটার ব্যাপার-সেপারতো ঢাকার বাজারে হয় শুনেছি। আধুনিক স্ত্রীরা মাছ কাটতে পারে না। বাজার থেকে মাছ কাটিয়ে নেয়..

—বাদ দে তো... তোর শরীরের অবস্থা কেমন?

—জ্বর কমেছে... তবে গায়ে ব্যথাটা যাচ্ছে না। তুই জিনের হ্রদে গিয়েছিলি?

—না কাল যাব

—আমার শরীরের যে অবস্থা, তোর সাথে যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। তুই ফরহাদকে নিয়ে যা, আমার চাচাত ভাই।

—আরে বাবা আমি একাই যেতে পারব...

—যাস, ইন্টারেস্টিং একটা জায়গা, আমার ধারণা আর্থ ক্রাস্টের প্লেট মুভমেন্টের কোনো ব্যাপার ঘটেছে ওখানে.. হঠাত্ করে একটা জায়গা এত নিচু হয়ে গেছে। বিশাল খাদ... নিচে পানি... কন্টিনেন্টাল ড্রিফট...

—উফ তোর জিওলজির লেকচার সব জায়গায় না মারলে হয় না? ...আমি গোসলে গেলাম।

আদনান গামছা নিয়ে হাঁটা দেয়। বাড়ির পেছনে পুকুর।

—চা নেন। চমকে ওঠে আদনান। হবীবের চাচাত বোন। এক কাপ চা নিয়ে বাড়ির পেছনে পুকুর ঘাটে দাঁড়িয়ে আছে। চা টা ঘরে দিলেও চলত হয়তো। এখানেও মন্দ না।

—ওহ ধন্যবাদ। চায়ের কাপটা হাতে নিতে গিয়ে আদনান তাকায় মেয়েটির দিকে। বিরাট ঘোমটার জন্য মুখ দেখা যায় না, খালি খাড়া নাকটা দেখা যাচ্ছে...

চা টা নিয়ে এগিয়ে যায় পুকুরের দিকে। আদনান টের পায় মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। কী যেন নাম বলেছিল হবীব। খুব সম্ভব পারভিন। বিয়ে হয়েছিল.. কোনো কারণে বিয়ে ভেঙে গেছে। গ্রাম দেশেও আজকাল বিয়ে ভেঙে যায় যখন তখন। এই নিয়ে কী যেন বলছিল হবীব।

পুকুর ঘাটে বসে চা খেতে খেতে আকাশের দিকে তাকায় আদনান। ঝকঝকে আকাশ। ঢাকার আকাশে কোনো তারা দেখা যায় না অথচ এখানে ঝকঝক

করছে তারা... বিলিয়নস অফ স্টার। আমাদের এই মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতে নাকি ২০০ বিলিয়ন তারা আছে। তার মধ্যে ছোট্ট একটা তারা সূর্য.. আর সেই সূর্যের ছোট্ট একটা গ্রহ পৃথিবী... সেই পৃথিবীতে মানুষের কত আয়োজন...

—কী দেখেন?

চমকে ফিরে তাকায় আদনান। ঘাটের পেছনে পারভিন দাঁড়িয়ে আছে এখনো। মাথায় ঘোমটা নেই। তাকে এখন অনেক সাহসী মনে হচ্ছে।

—ও তুমি, তারা দেখি... দেখছ আকাশে কত তারা।

—তারা দেখার কী আছে?

আদনান কিছু বলে না। খালি কাপটা শানবাঁধানো ঘাটে রাখতে যায়। চট করে এগিয়ে আসে পারভিন, দেন আমার হাতে দেন। তাড়াতাড়ি গোসল কইরা আসেন ভাত দিছি...

—এত তাড়াতাড়ি ভাত?

—গ্রাম দেশে আমরা তাড়াতাড়িই খাই...

—আচ্ছা আসছি।

—গামছা আনমু?

—না না গামছা আমি নিয়ে এসেছি।

পারভিন চলে যায়। আদনানের মনে হয়, সে কিছু একটা বলতে এসেছিল। কিছু একটা বলতে চায়। হবীব অবশ্য একবার পারভিন সম্পর্কে একটু সতর্ক থাকতে বলেছিল। বিষয়টা সে ঠিক বুঝতে পারেনি। মেয়েটার কি অন্য কোনো সমস্যা আছে? কে জানে!

ভাত খেতে বসে দেখে সে একা। সামনে পারভিন বসা। মাথায় যথারীতি লম্বা ঘোমটা। কিন্তু পুকুর ঘাটে তার কোনো ঘোমটা ছিল না।

—হবীব খাবে না?

—না উনার জ্বর বাড়ছে। চিড়া-পানি খাইয়া ওষুধ খাইয়া ঘুমাইছে।

—আর কেউ খাবার নেই? আমি একা একা খাব?

—সবাই খায়া ফেলছে। গ্রাম দেশে আমরা আগে আগে খাই।

—তুমিও খেয়ে ফেলছ?

—না।

—কেন? তুমি খাবে না?

—আপনেরে খাওয়াইয়া পরে খাব মার সাথে।

—তোমার মাকেতো দেখলাম না।

—মা পরপুরুষের সামনে আসে না।

—তাই?

—হ্যাঁ তার কঠিন পর্দা

চাপা গলায় হাসে পারভিন। যেন খুব মজার কথা বলেছে সে। আদনান মুখ তুলে তাকায়। পারভিন মেয়েটা যথেষ্ট আকর্ষণীয়। খাড়া নাক। দৃঢ় চোয়াল। যেটা ছেলেদের হলে মানায় কিন্তু ওকে মানিয়েছে। আদনানের বিয়ে করার পরিকল্পনা নেই। নইলে পারভিনকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা যেত... এই রকম একটা আকর্ষণীয় নারী পাশে থাকলে জীবনটা..

—তারা দেখতে আপনার ভালা লাগে? যখনই ঘাটে আসেন দেখি বইসা আকাশের তারা দেখেন

—হ্যাঁ ভালো লাগে।

—তারায় দেখার কী আছে? এই প্রশ্নটা মেয়েটা ঘাটেও করেছিল। এখন আবার করল।

—তারা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস.. আই মিন মহাকাশ। আমার সঙ্গে টেলিস্কোপ আছে। হাই ফ্রিকোয়েন্সি টেলিস্কোপ। ইনফেক্ট আমি হবীবের সঙ্গে এখানে এসেছি আকাশ দেখতেই। তোমাকে একদিন দেখাব আকাশের তারা কত বিচিত্র...

—আরেকটু ভাত নেন?

—না।

—কিছুইতো খাইলেন না।

—আমি কম খাই।

পাশে রাখা চিলমচিতে হাত ধুয়ে ফেলে আদনান। পান এগিয়ে দেয় পারভিন। পান খায় না আদনান, কিন্তু এখানে এসে খাচ্ছে। চমনবাহার দিয়ে কাঁচা সুপারি... ভালোই লাগে। মাথা গরম হয়ে ওঠে, কান দিয়ে ধোঁয়া বের হওয়ার অবস্থা।

—তুমি খেয়ে নাও।

—আপনার মশারি টাঙায়া দিব?

—না না আমি টানিয়ে নিব।

আদনান দেখে মেয়েটা কেমন এক চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। কিছু কি বলতে চায় সে? কী বলবে?

পারভিন বাসন-কোসন নিয়ে বের হয়ে যায়। খালি পায়ে মেয়েটা হাঁটে নিঃশব্দে। পারভিন চলে যেতেই সিগারেট নিয়ে বাইরে আসে আদনান। মার এত পর্দা পর-পুরুষের সামনে আসেন না। কিন্তু মেয়েকে ছেড়ে দিয়েছেন পরপুরুষের দেখভালের জন্য—বিষয়টা বোধগম্য হয় না আদনানের।

বাইরে এসে একটা সিগারেট বের করে। সাথে সাথেই ফস করে একটা ম্যাচের কাঠি জ্বলার শব্দ হয়। তাকিয়ে দেখে, জলন্ত ম্যাচের কাঠি হাতে ফরহাদ। সকালে একবার কথা হয়েছিল।

—চিনছুইন আমারে?

মাথায় টুপি, গাল ভাঙা থুতনিতে হালকা দাড়ি। বয়স বেশি না, তরুণই। কিন্তু বোঝার উপায় নেই। গলার গামছাটা দিয়ে সে মুখ মুছে শব্দ করে থুতু ফেলে আবার বলল, চিনছুইন আমারে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ চিনব না কেন। তুমি ফরহাদ, হবীবের চাচাত ভাই।

সিগারেট ধরায় আদনান তার কাছ থেকে আগুন নিয়ে।

—ভাইজান কিছু মনে না করলে একটু বেয়াদবি করতাম..

—মানে? প্রথমে আদনান বুঝতে পারে না। ফরহাদের হাতে সিগারেট দেখে বুঝতে পারে বেয়াদবির রহস্যটা। অর্থাত্ সে সিগারেট খেতে চাইছে তার সামনে।

—অবশ্যই অবশ্যই... আদনান বেয়াদবি করার অনুমতি দেয়।

—গুরুজনের সামনে সিগ্রেট খাওয়া বেয়াদবি। সিগারেট ধরিয়ে নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে ফরহাদ।

—না বিষয়টা আসলে ঠিক এমন নয়। আদনান বলে, গুরুজনের সামনে অপব্যয় করাটা বেয়াদবি। সিগারেট খাওয়াটাকে গুরুজনেরা অপব্যয় মনে করেন।

—ভালো কইছুইন।

আদনান লম্বা করে ধোঁয়া ছাড়ে। গাঢ় অন্ধকারে তার সাদা ধোঁয়া দ্রুত মিশে যেতে থাকে।

—ভাইজান, লইন কাইল আপনেরে জিনের হদ দেখায়া আনি।

—তুমি কাল ফ্রি আছ?

—জে আছি... সমস্যা নাই।

তারপর ফরহাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ হলো, জানা গেল সে পেশায় একজন দর্জি। ইলেকট্রিকের কাজও ভালো জানে। নষ্ট ফ্যানের কয়েল বানাতে সে ওস্তাদ। ঢাকায় থাকলে যে সে কত টাকা কামাতে পারত... শুধু হবীব ভাইয়ের কারণে হলো না। হবীব তাকে গঞ্জে একটা দোকান করে দিয়েছে। এই দোকান ঢাকায় থাকলে যে কী হতো... ইত্যাদি ইত্যাদি।

—এই এলাকায় এইটারে জনগণ বলে জিনের হদ।

—অদ্ভুত নাম। এই নামের মানে কী?

—আসলে গ্রামের লোকজন হ্রদ বলতে পারে না তো বলে হদ। আর জিনের মানে তাদের ধারণা—এটা মানুষের তৈরি না, জিনেরা তৈরি করেছে এই হ্রদ।

—বাহ ইন্টারেস্টিং।

—তারা বিশ্বাস করে কোহকাফ নগরীর জিনের বাদশার নির্দেশে এই হ্রদ তৈরি হয়েছে। তবে এটা আসলে একটা টেকটনিক হ্রদ... ভূ-অভ্যন্তরের শিলাস্তর বিচ্যুতির ফলে নিচে নেমে গেলে বা স্থানান্তরিত হলে ভূ-পৃষ্ঠের ওপরের দিকে এ ধরনের বিরাট গর্তের সৃষ্টি হয়ে এ রকম হ্রদ তৈরি করে.. অন্তত বইপত্র ঘেঁটে এখন পর্যন্ত আমি যা বুঝেছি।

—বাহ আপনিতো অনেক জানেন।

—আরে না, আমি গেবিন্দপুর হাইস্কুলের কম্পিউটার শিক্ষক। স্কুলে কম্পিউটার নাই তাই... ভূগোল পড়াই... মাঝে মাঝে বিজ্ঞানও পড়াতে হয়। কিছু প্র্যাকটিক্যাল খোঁজ-খবর রাখতে হয় আরকি ।

—কেন, এখন ডিজিটাল বাংলাদেশেতো গ্রামে গ্রামে কম্পিউটার পৌঁছে যাওয়ার কথা।

—না আমাদের এখানে কিছু হয় নাই এখনো। তবে আমার ছোট একটা ল্যাপটপ আছে। ঢাকা থিকা নিয়া আসছি। মাঝে মাঝে ওইটা ক্লাশে নিয়া যাই। ব্যাটারিতে চালাই। বিদ্যুতের অবস্থা ভালো না।

রিকশায় যেতে যেতে কথা হচ্ছিল গোবিন্দপুর হাইস্কুলের বদি মাস্টারের সঙ্গে । আদনান চলেছে জিনের হদ দেখতে । তাকে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল ফরহাদের। কিন্তু সকালে উঠে আর তাকে কোথাও পাওয়া গেল না। পারভিন বলেছে, সে নাকি গঞ্জে চলে গেছে। আদনান একাই রওনা হয়েছে। পথে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয়। একটা পায়ে সমস্যা বলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে যাচ্ছিলেন। আদনান তার রিকশায় তুলে নেয়।

—আচ্ছা ভাইজান, আমি এখানে নামি। সময় থাকলে আপনার সঙ্গে যেতাম...

—না না আমি একাই যেতে পারব। আপনি গেলে অবশ্য মন্দ হতো না। সে আরেকদিন যাব আপনাকে নিয়ে।

—জি অবশ্যই... এই রিকশা উনারে বটের মোড়ে নামায়া দেও। ওই মোড় থাইকা বিশ মিনিটের রাস্তা। লোকজনকে জিজ্ঞেস করলেই দেখায়া দিব।

—আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

—আপনাকেও ধন্যবাদ লিফট দেয়ার জন্য।

—আরে না... কী বলেন এক সাথে গল্প করতে করতে আসলাম। আচ্ছা চলি। রিকশায় বসে হাত নাড়ে আদনান শাফি।

হাইস্কুলের শিক্ষক বদি মাস্টার কাঁচা রাস্তা থেকে জমির আইলে নেমে হাঁটা ধরলেন। খুব শিগ্রি বড় বড় পাট ক্ষেতের আড়ালে তার কালো ছাতাটা হারিয়ে গেল।

বৃষ্টি নেই তবে প্রচুর রোদ। বটের মোড়ে এসে আদনান শাফি দেখে সেই বাচ্চা ছেলেটি হাপুস নয়নে কাঁদছে যার নাম সালু। পাশেই একজন ভ্যানওলা বসে আছে উদাস হয়ে। বাচ্চাটির কান্না তাকে আদৌ স্পর্শ করছে বলে মনে হয় না। আদনান রিকশার ভাড়া মিটিয়ে এগিয়ে যায় বাচ্চারটার কাছে–

—এই কী হয়েছে তোমার? তুমি সালু না?

—জে।

—কী হয়েছে তোমার?

বাচ্চাটা তাকে দেখে একটু অবাক হয়, কান্না থামিয়ে বলে, আমার বুজিরে ধইরা নিয়া গেছে?

—মানে কে?

ছেলেটা বলতে যায়। ভ্যানওলা ধমক দেয়, ওই চুপ থাক ছেমড়া... তোর বইন আইবনে।

—মানে? কড়া চোখে তাকায় আদনান ভ্যানওলার দিকে। ভ্যানওলা হঠাত্ কী মনে করে ভ্যানে উঠে প্যাডেল মেরে সরে পড়ে। আদনানের বিষয়টা অন্যরকম লাগে। সালুর হাত ধরে শান্ত স্বরে বলে–

—কে তোমার বোনকে নিয়ে গেছে?

—মোড়ল শিকদার।

—কোথায়?

—ওই দিকে... ছেলেটা ভ্যানওলা যেদিকে গেল সেদিকে হাত তুলে দেখায়।

—চলোতো।

সালু এবার যেন আশার আলো দেখতে পায়। দ্রুত চোখ মুছে হাতের উল্টো পিঠে। তাকে ইশারা করে দৌড়াতে শুরু করে। আদনানও তাকে অনুসরণ করে লম্বা লম্বা পা ফেলে। মিনিট দশেক পরে আদনান বাচ্চার পিছু পিছু এসে হাজির হয় একটা মাটির ঘরের সামনে। ছোটখাটো একটা ঘর, ওপরে টিনশেড, চারদিকে গাছ-গাছালি দিয়ে আড়াল করা। একটা লুকাছাপা ভাব আছে ঘরটায়। ঘরটার বাইরে সেই ভ্যানটা। ভ্যানওলার সাথে আরেকটা লোক। তার হাতে একটা তেরছা বাঁশ। ভ্যানওলার মুখটা এখন হাসি হাসি। অন্য লোকটার ভাব-ভঙ্গিতে একটা আক্রমণাত্মক ভাব।

—এই মিয়া এইখানে কী চান?

—এরা আমার বইনরে ধইরা আনছে। সালু ফিস ফিস করে বলে মোড়ল শিকদারের লোক এরা।

—এরাই? আদনান নিশ্চিত হতে চায়।

—জে।

—এর বোন কোথায়? কিছু না বুঝেই ওদের বলে আদনান।

—এর বইন আপনার... কী লাগে?

মাঝখানের শব্দটা ধরতে পারে না আদনান, তবে শব্দটা যে ভালো কিছু নয়, তা তাদের দু জনের চাপা অশ্লীল হাসিতে বুঝতে পারে। তেরছা বাঁশ হাতে লোকটা এগিয়ে আসে। আদনান একহাতে বাচ্চাটাকে পেছনে সরিয়ে দেয়। এরা ঠিক কী করতে চায়? সমস্ত বিষয়টাই আদনানের কাছে অস্পষ্ট। তবে এটুকু বোঝা গেছে, মোড়ল শিকদার লোক ভালো না। এই বাচ্চাটির বোনকে কোনো কারণে উঠিয়ে এনেছে তার লোকেরা। কিন্তু কেন?

—বাঁশ হাতের লোকটা হঠাত্ এগিয়ে এসে বাঁশটা দু হাতে ধরে আদনানের বুকে ঠেকিয়ে ঠেলা দিল বাজেভাবে— ঢাকার থাইকা আইছেন... জিনের হদ দেইখা ঢাকা ফিইরা যা... এইখানে প্যাঁচ খেলায়েন না... জাগা কিন্তু ভালো না কয়া দিলাম...

লোকটা বলশালি, চোখের দৃষ্টি ধূর্ত... তবে তারা জানে না ছিমছাম শরীরের আদনান শাফি একজন হিয়েন এক্সপার্ট 'জ্যান মেডিটেশন' করা একজন মানুষ... কখনো কখনো সে কোনো কারণ ছাড়াই অন্য কেউ হয়ে ওঠে!

...আদনান শাফির মাথার ভেতরটা দপ দপ করছে.. তাকে সতর্ক হতে হবে। সামনের ওই লোক দুটির জন্য নয়। তার নিজের জন্য। জ্যান মেডিটেশন করার সময় তার কোরিয়ান ট্রেইনার চুয়ান হি বলেছিল— মনে রাখবা, এইডা আর্মি কমান্ডোদের একটা এক্সক্লুসিভ ট্রেনিং.. ডেডলি গেম... তুমি কিন্তু সিভিলিয়ান...!

...আদনান তার দুই চোখের ভিশনটাকে ছোট করে আনে..

...মাথার ভেতরে কেউ তাকে সতর্ক করছে... কুল... আদনান কুল... সীমানা অতিক্রম করবা না... তোমার রাগের চেয়ে মানুষের জীবনের মূল্য অনেক বেশি...'

সালু আশ্চর্য হয়ে দেখল। ঢাকা থেকে আসা বাজারে কই মাছ কেনা লোকটার পায়ের কাছে ভ্যানওলাসহ বলশালি লোকটা পড়ে আছে। লম্বা তেরছা বাঁশটা মাঝখানে দু টুকরো হয়ে ভাঙা। এদের আর্তচিৎকারে দরজা খুলে তৃতীয় একটা লোক বের হয়ে আসে, ছোটখাটো, মাথায় টাক। এই কি মোড়ল শিকদার? লোকটা বুদ্ধিমান, বাইরের পরিস্থিতি দেখেই দরজা থেকে একটু সরে দাঁড়ায় আর একটা মেয়ে বের হয়ে আসে। ময়লা শাড়ি পরা এক তরুণী ভীত-সন্ত্রস্ত... তাকে দেখেই সালু ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরে। সম্ভবত এই তার বুজি।

—বুজি এই সারে তোমারে বাঁচাইছে। সালু বলে।

ভীত-চকিত তরুণী আদনানের দিকে তাকায়। শক্ত করে চেপে ধরে ছোট ভাইটার হাত।

—এরা তোমার লোক?

—হ আপনে কেডা?

—তুমি... এর বোনকে ধরে এনেছিলে কেন?

—কারণ সে বাজারের মেয়ে... ইনজয় করতে আনছি পয়সা দিমু সমস্যা কী?

—সমস্যা নাই?

—কিসের সমস্যা?

চটাস করে একটা শব্দে মোড়ল শিকদার ঘুরে পড়ে। তার ঠোঁটের কোণ দিয়ে চিকন একটা রক্তের ধারা বের হয়ে আসে। মোড়ল শিকদার খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে উঠে বসে যেন এরকম চড়-থাপ্পর খাওয়ার ঘটনা প্রায়ই ঘটে। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখটা মোছে তারপর আদনানের দিকে তাকায়। শীতল চোখ, মুখটা হাসি হাসি...

—দেখা হইব তোমার সাথে আবার, বলে মোড়ল শিকদার। আদনান তার বলার ধরনে বুঝতে পারে লোকটা ছোটখাটো হলেও ভয়ঙ্কর।

—আমার মনে হয় আপনি চলে যান এই গ্রাম থেকে।

—কোথায়?

—কেন ঢাকায়।

—কেন?

—কেন আপনি বুঝতে পারছেন না? আপনি কোথায় হাত দিয়েছেন?

—কোথায়?

—কেন মোড়ল শিকদার। সে ভয়ঙ্কর লোক।

—আমি জানি। লোকটাকে দেখে তাই মনে হয়েছে।

—সে ভয়ঙ্কর এবং প্রভাবশালীও বটে।

—ভয়ঙ্কররাই প্রভাবশালী হয়। এটাইতো জগতের নিয়ম। দার্শনিকের মতো বলে আদনান শাফি। বদি মাস্টারের সাথে সে বসে আছে গ্রামের বাজারে। আজ গ্রাম ফাঁকা। পালিশ করা বাঁশের বেঞ্চিতে বসে আছে তারা।

—আপনি বোধ হয় ধূমপান করেন না? আদনান সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলে।

—করি।

—তাহলে নিন।

—না, আমি দিনে তিনটার বেশি সিগারেট খাই না। তিনটা খাওয়া হয়ে গেছে।

—কেন?

হাসে বদি মাস্টার, আমি আসলে নন স্মোকার। যেই লোক দিনে মাত্র তিনটা সিগারেট খায় সে অতি অবশ্যই নন স্মোকার।

—কী রকম?

—আমি যদ্দুর জানি, একটা সিগারেটের নিকোটিন রক্ত থেকে মুছে যেতে সময় নেয় আট ঘণ্টা। তাই দিনের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আট ঘণ্টা পর পর তিনটা সিগারেট খাই...

—বাহ দারুণ হিসাব। এটা কী সত্যি?

—আমি তা-ই জানি। তাহলে আপনি গ্রাম ছাড়ছেন না?

—না। আসলে মোড়ল শিকদারের লোকটা শেষ পর্যন্ত মারা যায়নি। কাজেই আমার মনে হয় না, তেমন কিছু ঘটবে। ঘটলেও তার জন্য আমি প্রস্তুত আছি।

—আপনি সাহসী লোক সন্দেহ নেই এবং আপনাকে ধন্যবাদ।

—কেন?

—সালুর বোনকে উদ্ধার করার জন্য।

—ওই পরিস্থিতিতে আপনি থাকলেও হয়তো তা-ই করতেন।

—না আমি করতাম না। উঠে দাড়ায় বদি মাস্টার—আমি আসলে পারতাম না... স্যার চলি।

—আমাকে স্যার বলছেন কেন?

—এমনি... হাসে বদি মাস্টার। আরো কিছুক্ষণ আপনার সঙ্গে থাকতে পারলে ভালো লাগতো। কিন্তু যেতে হচ্ছে একটা জরুরি কাজে। তবে ভাববেন না, যতদিন গ্রামে আছেন আছি আপনার সাথে...

বদি মাস্টার খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে রওনা দেয়, বসে থাকে আদনান। তার বসে থাকতে ভালো লাগে। বাসায় যাওয়া দরকার। হবীব নিশ্চয়ই ক্ষেপছে। বেশ দ্রুত কিছু ঘটনা ঘটে গেছে। সবগুলোর দায় কি আদনানকে নিতে হবে? তার কেন যেন মনে হচ্ছে, সে আর এই গ্রাম থেকে ফিরে যেতে পারবে না— কেন এমনটা মনে হচ্ছে কে জানে। কখনো কখনো এমন কিছু পরিবেশগত অনুভূতি হয় মনে হয় এলাকাটা পরিচিত, ঘটনাটা পরিচিত আগে কখনো ঘটেছে। এমনটাই লাগছে আদনানের। তার মাথার ওপরের বিশাল রেইনট্রি গাছটার দিকে তাকিয়ে হঠাত্ মনে হলো, আরে এই গাছটাওতো তার পরিচিত... এটা কিভাবে সম্ভব!

আদনান উঠে হাঁটা শুরু করে। অনেকক্ষণ হাঁটার পর সে টের পায়, সে আসলে হবীবের বাসার দিকে যাচ্ছে না। পথটা জিনের হদের দিকে। কোহকাফ নগরীর জিনের বাদশাহর নির্দেশে যেই হ্রদ তৈরি হয়েছে... সেই জিনের হদের পথ। কোনো কারণ ছাড়াই আদনান হাসে।

—আচ্ছা তোর এক্স প্রেমিকের নাম যেন কী ছিল?

—কেন? আমার এক্স প্রেমিক নিয়ে তোর হঠাত্ কী দরকার?

—আহ বল না।

—আদনান শাফি।

—রাইট, তার সাথে সেদিন দেখা।

—তাই নাকি? কোথায়?

—এলিফেন্ট রোডে।

—তারপর?

—আমাকে দেখে এগিয়ে এল নিজের থেকে।

—আচ্ছা... কী বলল শয়তানটা?

—উফ... তুই এখনো তাকে শয়তান বলিস কেন বলতো?

—কারণ... না থাক বলব না।

—আচ্ছা একটা কথা বলতো ছ্যাঁকা তুই দিয়েছিস্, না ও তোকে ছ্যাঁকা দিয়েছে?

—অবশ্যই আমি দিয়েছি। ... আচ্ছা বল না কী বলল শাফি?

—বলল...

এই সময় ঝননন... ননন... শব্দে কলিংবেল বেজে উঠল।

—এই প্রসঙ্গ থাক ও চলে এসেছে। মিলি বিছানা থেকে নামে।

—তাতো থাকবেই আমি তাহলে ওঠি রে...

—বয় না, ওর সাথে একটু কথা বলে যা।

—না বাবা... কাজ আছে একটা খুবই জরুরি...

দরজা খুলতেই সুদর্শন আন্দালিব। হাই কী খবর মিস.. মনরুবা?

—উফ আমার নাম দিলরুবা।

—ওইতো দিল আর মন... একি কাহানি। চললে নাকি? বস গল্প করি।

—না আপনি অফিস থেকে এলেন রেস্ট নিন। আমি অনেকক্ষণ বসেছি। এখন আপনার দিলকে সময় দিন। বলে হাসির ভঙ্গি করে।

—না না এক কাপ কোল্ড কফি খেয়ে যাও অন্তত।

—বেশ আপনি নিজে বানিয়ে খাওয়ালে খেতে পারি।

—ওকে নো প্রবলেম।

আন্দালিব কিচেনে ঢুকে গেল সিরিয়াসলি। মিলি চোখ মটকালো দিলরুবার দিকে।

—তোর বর কোল্ড কফি বানাতে পারে জানতাম নাতো?

—কোল্ড কফি না হাতি খেয়েই দেখ না...

খুব দ্রুত কোল্ড কফি নিয়ে হাজির হল আন্দালিব।

—এই নিন দিলরুবা।

—দু বার ধন্যবাদ।

—দু বার কেন?

—প্রথমবার আমার সঠিক নামে ডাকার জন্য আর দ্বিতীয়বার হচ্ছে আপনার কোল্ড কফির জন্য।

—ওয়েল কাম... কফি খেতে খেতে তোমাকে একটা জোক শোনাই...

...ট্রাফিক সপ্তাহ চলছিল। হঠাত্ ট্রাফিক সার্জেন্ট একটা গাড়ি থামাল...

—গাড়ি থামালেন যে? আমিতো কোনো ভুল করিনি। গাড়ির চালক বলল।

—তা করেননি। আসলে ট্রাফিক সপ্তাহ চলছে তো, আপনাকেই দেখলাম সঠিকভাবে আইন মেনে গাড়ি চালাচ্ছেন, সিট বেল্টও বাঁধা আছে... সেজন্য আমরা পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে নগদ পাঁচ হাজার টাকা আপনাকে পুরস্কৃত করলাম... এই নিন খাম...

—ওহ সত্যি? আমি সত্যিই ভাগ্যবান...

—আপনি এখন এই টাকা দিয়ে কী করবেন? পুলিশ সার্জেন্ট হাসিমুখে জানতে চায়।

—প্রথমেই গাড়ির লাইসেন্স করব।

—কী? ক্কী? আঁকে ওঠে ট্রাফিক সার্জেন! আপনার লাইসেন্স নেই??

এ সময় চালকের পাশে বসা স্ত্রী এগিয়ে এসে বলে, প্লিজ অফিসার, ওর কথা বিশ্বাস করবেন না, মদ খেয়ে যখন ও গাড়ি চালায় তখন উল্টা-পাল্টা কথা বলে...

—হোয়াট? উনি ম-মদ খেয়ে গাড়ি চালাচ্ছেন? সার্জেন্ট হতভম্ব! তখন পিছনের সিটে বসা চালকের বাবা বিরক্ত ভঙ্গিতে বললেন, তখনি বলেছিলাম এই চোরাই গাড়ি নিয়ে বের হয়ে কাজ নেই.. ঝামেলা হতে পারে!

সার্জেন্টের হেচকি উঠে যায়! হো-হোয়াট? এটা চোরাই গাড়ি?

এই সময় গাড়ির পেছনের ডিকিতে ঠক ঠক শব্দ হয়, ডিকির ভেতর থেকে ফিস ফিস আওয়াজ আসে, ওস্তাদ বর্ডার কি পার হইছি? ডাইলের বস্তা বাইর করুম?

ধুপ করে একটা শব্দ হয়। না ডাইলের বস্তা পরার শব্দ নয়। ট্রাফিক সার্জেন্টের অজ্ঞান হয়ে আছড়ে পড়ার শব্দ।

জোক শেষ করে হো হো করে হেসে উঠল আন্দালিব।

—কী হলো তুমি হাসলে না যে?

—সত্যি কথা বলতে কি আন্দালিব ভাই, এই জোকটা আমি আগেই শুনেছি।

—তাতে কী? শোনা জোক শুনেও হাসতে হয় এটাই নিয়ম...

—আপনার নিয়ম আমি মানতে পারলাম না বলে দুঃখিত। তবে আপনার কোল্ড কফি অসাধারণ হয়েছে।

—থ্যাঙ্কস...

দিলরুবা বিদায় হতেই আন্দালিব হঠাত্ গম্ভীর হয়ে গেল।

—বস, তোমার সাথে জরুরি আলাপ আছে।

টাই খুলতে খুলতে আন্দালিব একটু যেন গম্ভীর হয়ে যায়। কোনো কারণ ছাড়াই মিলির বুকটা ধক করে ওঠে। ওকি তবে কিছু টের পেয়েছে।

—আদনান শাফি নামে তুমি কাউকে চিন? বা চিনতে?

—হু। কেন?

—কী সম্পর্ক ছিল তার সাথে?

—ক্লাস মেট।

—আর কিছু?

—হ্যাঁ... প্রথম প্রেম বলতে পার। মুখ শক্ত করে বলে মিলি।

—ওহ থ্যাংকস্ ... গুড গার্ল। আন্দালিব হাসি মুখে তাকায় তার দিকে। শাফির এক বন্ধুর সাথে দেখা।

কথায় কথায় অনেক গল্প হলো। সে আবার তোমাকে চিনে। এই আরকি নাথিং সিরিয়াস... চল ভাত খাই!

মিলির বুক থেকে ভার নেমে যায়। আচ্ছা তার এত ভয় পাওয়ারই কী আছে? আন্দালিবের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে সব জেনে শুনেই। তার একটা হালকা সম্পর্ক ছিল এতো তখন সবাই জানতো।

ভাত খেতে খেতে আদনান সম্পর্কে আরেকটু তথ্য জানা গেল। সে নাকি একটা অজপাড়া গাঁয়ে থাকে। সেখানে একটা মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে একটা মহাঝামেলা পাকিয়েছে, পুরো বাংলা সিনেমা। বেশ জটিল ঝামেলা। একজন খুনখারাবিও হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে।

—বল কী?

—হ্যাঁ, পেপারে এসেছে খবরটা।

—আদনান খুন করেছে?

—অনেকটা ওইরকমই। সেকি খুনে টাইপের ছিল?

—না, তবে...

—তবে?

—তবে সে জ্যান মেডিটেশন করত...

—সেটা আবার কী?

—এটা নাকি এক ধরনের ডেডলি কমান্ডো ট্রেনিং.. আর্মিদের...

—সেকি আর্মিতে ছিল?

—না।

—তাহলে?

—ও শিখেছে।

—এটা জানা থাকলে কী হয়?

—এটা যারা জানে তারা... থেমে যায় মিলি। তার আর বলতে ইচ্ছে করে না। ঠিক এই কারণেই তার সাথে আদনানের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

হবীবের জ্বরটা ছেড়েছে। শেষ রাতের দিকে সে একটা গোসল দিয়েছে। তারপরেই মনে হয় জ্বরটা ছেড়ে গেছে। এই গোসলটা আরো আগে দিলে বোধ হয় ভালো হতো। তবে একরকম সুস্থ হয়ে উঠলেও সে যথেষ্ট গম্ভীর। পারভিনকে ডেকে পাঠাল।

—আদনান কখন বাইরে গেছে?

—হেই সকালে।

—কই গেছে?

—কয়া যায় নাইতো। কইছে দুপুরে খাইতে আসব।

—ওরে এখানে আনা ঠিক হয় নাই।

—কেন?

—ও এইখানে একটা বড় ঝামেলায় জড়াইছে নিজেরে। একজন মানুষ নাকি মারছে সে?

—কী বলেন? পারভিন শিউরে ওঠে। সে অবাক হয়, হবীব জ্বরের মধ্যে ছিল। সে এসব জানলো কিভাবে। বলেই ফেলে।

—আপনিতো বিছানায় ছিলেন জ্বরের মধ্যে এই খবর আপনেরে কে দিল?

—ফরহাদ মোবাইল করছে।

—কারে, মারছে?

—শিকদারের লোকরে।

—হায় হায়... মুখে কাপড় দিয়ে আঁেক ওঠে পারভিন। লোকটা কি সত্যি মরছে?

—সেই রকমই শোনা যাইতাছে.. হাসপাতালে নিতে নিতেই নাকি মরছে।

—এখন কী হইব? শিকদারতো লোক ভালো না।

—তুমি এক কাজ কর।

—কী কাজ?

—আদনানের ব্যাগ অ্যান্ড ব্যাগেজ সব গুছায়া রাখ।

—কেন?

—সে আসলেই চলে যেতে হবে ওকে। সে গ্রামে বিপদ ডাইকা আনতাছে। নিজেও মরব আমগোও মারব।

—আচ্ছা।

—আরেকটা কথা...

—জি বলেন।

—এসব কথা আবার তোমার মারে জানাইও না।

—না জানাব না।

—যাও আমারে কড়া লিকারের এক কাপ চা দাও।

—দেই।

তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, সে রাতে আদনান ফিরল না। তবে তার আগেই মোড়ল শিকদারের লোকজন এল। হবীবের কাছে। দলে তারা বেশ ক জন। হবীব পুকুরপাড়ে ছিল, তাকে পারভিন খবর দিল।

—হবীব ভাই, আসসালামু আলাইকুম।

—ওয়ালাইকুম।

—ভালো আছেন?

—হ্যাঁ ভালো... কে তোমরা?

—চিনেন নাই আমরা শিকদার চাচার লোক।

—ও আচ্ছা কী ব্যাপার?

—ঢাকা থেকে যে লোকটা আসছে এখানে সে কোথায়?

—ক্যান?

—তারে আমাদের দরকার।

—সে তো রাতে ফিরে নাই।

—না ফেরাই ভালো। পাশ থেকে একজন মন্তব্য করে।

—কেন কী হইছে ?

—আপনে জানেন না?

—না। কোনো সমস্যা?

—সমস্যা বললে সমস্যা... তাদের একজন উদাস গলায় বলে।

—কী হয়েছে? আবার প্রশ্ন করে হাবীব।

তারা কথার উত্তর দেয় না। হঠাৎ ঘুরে হাঁটা দেয়। হবীব রাতের অন্ধকারে টের পায়, তাদের সবার হাতে রাম দা।

একজনের গায়ে চাদর। সম্ভবত সেই দল নেতা। তার হাতে যে অস্ত্র আছে সেটা চাদর পরার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যাচ্ছে। তাকে হাবীব চিনতে পারল, মোড়ল শিকদারের ডান হাত। দাগি আসামী।

—ভাইজান? হাবীব তাকিয়ে দেখে পিছে এসে দাঁড়িয়েছে পারভিন, তার মুখে শঙ্কা।

—বল?

—আপনার বন্ধুর কী হইব?

—সেটাতো আমিও বুঝতে পারতেছি না। এরাতো মনে হচ্ছে সহজে ছাড়বে না। আমার বন্ধু, আমাকেও কিছু করতে পারত ওরা। ভাগ্য ভালো কিছু করে নাই। শোন-

—বলেন?

—এরশাদ চাচার বন্দুকটা বাইর কর। হাতে থাকা ভালো।

—বন্দুক পরে, আপনে আপনের বন্ধুরে খুঁইজ্যা বাইর করেন আগে।

—কিভাবে খুঁজবো কোথায় গেছে কে জানে। ফরহাদ কই?

—সে গঞ্জে গেছে। ফিরে নাই।

—উফ এই সময় সে আবার গঞ্জে... হবীব পকেট থেকে মোবাইল বের করে আদনানের নাম্বারে আবার টিপে, একটা সুকণ্ঠী নারী বলছে, মোবাইল ক্যান নট বি রিচ...

ফরহাদকে ফোন দেয় সে।

—এই ফরহাদ তুমি কই?

—এই তো গেরামে ঢুকছি।

—তাইলে শাফিরে খুঁইজা বাইর কর জলদি.. ওর অনেক বিপদ।

—জি যাই।

ফরহাদ অবশ্য আদনানের খোঁজে বের হয় না। তার মেজাজটা খারাপ। তার দোকানে চুরি হয়েছে। তেমন বড় চুরি নয়। আবার খুব কমও নয়। কাটা কাপড়ের একটা বান্ডিল কেউ সরিয়েছে। সে মন ভালো করতে ঘোরাপথে

পুকুর পারে এসে একটা ঝোপের আড়ালে অন্ধকারে বসে সিগারেট ধরায়। হাতের ঘড়িটার দিকে তাকায়। সময় হয়েছে। এখন পারভিন গোসল করতে পুকুরে নামবে। পারভিন সন্ধ্যায় গোসল করে। এই সিন মিস করতে চায় না ফরহাদ। আকাশে চমৎকার একটা চাঁদ উঠেছে। পুকুরঘাট পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আজ পূর্ণিমা নাকি? নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে থাকে ফরহাদ। মরা পাতা পাড়ানোর শব্দ শোনা যাচ্ছে। পারভিন আসছে...।

আদনান শাফি বসে আছে জিনের হদের ওপর। আসলে যেটা হ্রদ। একটা খাড়া ফাটল নিচের দিকে নেমে গেছে। উঁকি দিলে নিচে কালো জল চোখে পড়ে। কান পাতলে কল কল শব্দ শোনা যায়। হঠাত্ শব্দে আদনান শাফি ঘুরে দাঁড়ায়। সালু হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

—তুমি?

—হ আমি... আইসি।

—তোমার বোনকে কোথায় রেখে আসছ?

—খালার বাড়িত।

—গুড বয়। ছেলে বুদ্ধিমান, সে ঠিক বুঝতে পেরেছে আজ নিজেদের জায়গায় থাকলে বিপদ হতে পারে। মোড়ল শিকদার ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয় নিশ্চয়ই। তার একজন লোক খুব সম্ভবত গুরুতর আহত, তবে গুজব রটে গেছে সে মারা গেছে। এর জন্য আদনান খুব দুঃখিত কি? বলা মুশকিল।

—লইন হেই দিক যাই।

—কোথায়?

—হেই দিকে একটা নামা আছে, নিচে নামা যায়।

বিষয়টা ধরতে পারল না আদনান, বাচ্চাটা ঠিক কী বলতে চাচ্ছে। তবে তাকে অনুসরণ করল। আদনান আশ্চর্য হয়ে আবিষ্কার করল ছেলেটি তাকে ঘোরাপথে জিনের হদের ভেতরে নিয়ে এল। অনেকটা ভাঙাচোরা সিঁড়ির মতো নেমে গেছে, যেটাকে সে নামা বলছে। জায়গাটা ঝোপঝাড়ে আড়াল হয়ে আছে বলে এদিকে কেউ আসে না। আরেকটা কারণ অবশ্য আছে, মানুষের ধারণা জিনরা বিরক্ত হবে।

আদনান অবশ্য জিনের হদের পরিভ্রমণটাকে ঠিক উপভোগ করতে পারছে না। সে বুঝতে পারছে, সে একটা ভালো ঝামেলায় পড়তে যাচ্ছে। নিজের জন্য সে চিন্তিত নয়। তার ভাবনা হচ্ছে হবীবের জন্য, এই বাচ্চা আর তার বোনটার জন্য...

—ও ছার দেহেন।

আদনান শাফি আশ্চর্য হয়ে তার দৃষ্টি অনুসরণ করে ওপরে তাকিয়ে দেখে। এই কিছুক্ষণ আগেও তারা ঠিক ওই খান থেকে এই নিচের দিকে তাকিয়েছিল। এখন তারা সেই কালো জলস্রোতের ধারে। জলের কল কল শব্দটা অসাধারণ লাগছে আদনান শাফির, বাইরে আলো কমে আসছে।

জলের ওপর পড়েছে ওপরের এক টুকরো আকাশের ছায়া। কী এক রহস্যময় পরিবেশ যতটা না ওপরে তার চেয়ে হাজার গুণ নিচে।

—এখানে আসার এই পথ তুমি বের করেছ?

—জে হ।

—আর কেউ জানে?

—মতি জানে।

—মতি কে?

—আমার দোস্ত।

—তোমার দোস্ত কই?

—হেয় শহরের হাই স্কুলে পড়তে গেছে। আর আইয়ে না।

জুতা খুলে প্যান্টের পা গুটিয়ে পানিতে নামে আদনান শাফি। শীতল পানি। কালো জলের ওপর বাইরের রহস্যময় হালকা আলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে আদনান শাফির ছায়া। আর তখনই ঘটনাটা ঘটল। আদনানকে ঘিরে জলের ওপর ছায়ার সংখ্যা বাড়তে লাগল। অনেকগুলো সশস্ত্র মুখ জিনের হদে উঁকি দিচ্ছে।

—ছার হেরা আইছে। ভীত কণ্ঠে ফিস ফিস করে সালু।

—মোড়ল শিকদারের লোক?

—জে হ।

—তারা কি এই ভেতরে আসার রাস্তাটা জানে?

—না।

—তাহলে ভয় কী?

মুখগুলো উঁকি মারল। কিছু কথাবার্তা বলল। তারপর সরে গেল। তার মানে কি তারা আদনান শাফিদের দেখতে পায়নি? বোধ হয় না।

—হেরা আমগো দেহে নাই।

—তাই মনে হচ্ছে। চল আমরা বের হই

—লইন।

জিনের হদ থেকে ওরা নিরাপদে বের হয়ে হাঁটা দিল বাজারের দিকে। আকাশে তখন একটা দিব্যি চাঁদ উঠেছে। তার আলোর দুটো অসম ছায়া ফেলে তারা হেঁটে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাত্ ছায়ার সংখ্যা বেড়ে গেল যেন। ছায়াগুলো গোল করে ঘিরে ধরেছে তাদের। অনেকগুলো মানুষ প্রায় ষোল-সতের জন। সবাই সশস্ত্র! তার মানে ওরা আশেপাশেই ঘাপটি মেরে ছিল। আদনানের মাথায় দ্রুত চিন্তা চলে। সে একজন হিয়েন এক্সপার্ট... একজন দু জন তিনজন চারচজনকেও ফেলে দেওয়া সম্ভব কিন্তু ষোল জন..

—কেমুন আছেন ঢাকার হিরো সাহেব? বেঁটে লোকটা এগিয়ে আসে। কাছে আসতেই টের পায় লোকটা শিকদার মোড়ল।

—ভালো আছি। কী চান আমার কাছে? দ্রুত চিন্তা চলে আদনানের মাথায়।

—আমি যা চাই তা নিজেই আদায় কইরা নেই। এই তোমরা কী কও ঠিক কি না?

—জে ঠিক। তারা সমস্বরে বলে।

আদনান খেয়াল করে, সালু ভয় পেয়েছে, তার গায়ের সঙ্গে সেঁটে আছে।

—আপনারা কি আমাকে মেরে ফেলার প্লান করেছেন?

—আশ্চর্য! কেমনে বুঝলেন?

—আমাকে যা ইচ্ছা করেন। কিন্তু এই বাচ্চাটাকে আশাকরি কিছু করবেন না।

—না না, ওরে খালি যাদবে ধইরা একটা আছার দিব, তারপরও যদি ওর মাথার মধ্যে ঘিলু থাকে... তো বাঁইচাই গেল। কই? যাদব কই? যাদব? ওদের মধ্যে থেকে একজন বের হয়ে আসে... যার ছায়াটা অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি দীর্ঘ। সে এগিয়ে আসে, তার মুগুরের মতো বলশালি হাতে কোনো অস্ত্র নেই। আদনান আর দেরি করে না। কনুইয়ের ভাঁজের কাছে ব্যান্ড দিয়ে বাধা ছ ইঞ্চি ছোরাটা আলগোছে চলে আসে তার হাতের

তালুতে... বিদুৎগতিতে আরেক হাতে গলা পেঁচিয়ে ধরে মড়ল শিকদারের। ছোরাটা গলার কাছে ধরে ঠান্ডা স্বরে বলে—

—সামান্য বেচাল দেখলে ওর গলা ফাঁক করে দিব আমি।

সবাই যেন থমকে গেল...

বদি মাস্টার তার ল্যাপটপ খুলে বসে আছে। একটা হাত তার কি-বোর্ডে কিন্তু চোখের দৃষ্টি তার অন্য কোথাও। এই মুহূর্তে তাকে দেখলে মনে হচ্ছে, সে গ্রামের সাধারণ কোনো শিক্ষক নয়; সে অন্য কেউ!

—মাস্টর? এরকম হঠাত্ ডাকে বদির চমকে ওঠার কথা। সে মোটেই চমকালো না, মাথা ঘুরিয়ে দরজার দিকে তাকাল। ফরহাদ দাঁড়িয়ে আছে। নিশ্চয়ই হবীব ভাই পাঠিয়েছে।

—মাস্টার ঢাকার লোকটারে দেখছেন? তারতো মহাবিপদ।

বদি মাস্টার কথা বলে না। হাত তুলে ইশারা করে.. যার অর্থ দুটাই হতে পারে—দাঁড়াও অপেক্ষা কর বা চলে যাও। ফরহাদ বুঝতে পারে না কী করবে। তবে সে অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই বদি মাস্টার লোকটাকে তার পছন্দ। বিপদ-আপদ হলেই এর কাছে ছুটে আসে। লোকটা ভালো পরামর্শ দেয়। যেকোনো বিষয়ে তার অগাধ জ্ঞান। এইতো সেদিন বাজারে সে বদি মাস্টারকে আটকাল—

—মাস্টর?

—বল?

—একটা বিষয়ে পরামর্শ দরকার।

—কী পরামর্শ?

—আমি একটা পাপ করছি।

—কী পাপ করছ?

—চুরি করছি।

—কী চুরি করছ?

—হবীব ভাইয়ের মানিব্যাগ থাইকা একটা এক শ টাকার নোট সরাইছি.. অবশ্য চালাইতে পারি নাই, স্কচটেপ মারা ট্যাকা। সাথেই আছে দেখবেন?

—দেখার দরকার নাই।

—এখন অপরাধবোধে ভুগতাছি, কী করি? এই অপরাধের থাইকা মুক্তির উপায় কী মাস্টর?

—প্রথম কথা হইল... পাপ আর অপরাধ এক জিনিস না। পাপে তোমার নিজের ক্ষতি, অন্যের তেমন কোনো ক্ষতি হয় না। তবে অপরাধ হলো বড় জিনিস—সামাজিক ক্ষতি... বুঝতে পারছ?

—আরেকটু পরিষ্কার করেন মাস্টর।

—তুমি যে এক শ টাকা চুরি করছ—এইটা অবশ্যই পাপ, তোমার নিজের পাপ। কিন্তু এই পাপে হবীবের তেমন কোনো ক্ষতি হবে না। তার অনেক টাকা, সে টেরই পাবে না। কিন্তু তুমি নিজে বিবেকের দংশনে জ্বলছ..

বিষয়টা নিয়ে পরে ফরহাদ ভেবে চমকিত হলো। দারুণ কথা!

অবশ্য সেই চুরি করা টাকাটা সে খরচ করেনি। তালে আছে এক ফাঁকে টাকাটা আবার হবীব ভাইয়ের মানিব্যাগে ঢুকিয়ে দেবে। কিন্তু সেই সুযোগ হচ্ছে না।

আদনান মোড়ল শিকদারের গলায় চেপে ধরে আছে ছোরাটা। লোকটা হাঁস-ফাঁস করছে। এরপর কী হবে আদনান ঠিক জানে না। কিছু কিছু সিদ্ধান্ত মানুষ নিতে পারে না, নেয় সময়! আর ঠিক সেই সময় মোড়ল শিকদার কথা বলে ওঠে ফিস ফিস করে—

—আদনান স্যার, মোড়ল শিকদারকে ছেড়ে দেন... দেখেন সে কিচ্ছু করবে না।

আশ্চর্য, কথাটা বলল বদি মাস্টর মোড়লের গলায়। ছেড়ে দিল

আদনান আর সত্যি সত্যি মোড়ল শিকদার কী একটা ইশারা দিয়ে তার লোকগুলোকে নিয়ে হাঁটা দিল বাজারের দিকে। যেন একটু আগেও কিছু হয়নি। ওরা চলে যেতেই খেয়াল হলো, তার ছোট্ট মাথাটা চেপে ধরে আছে সালু। বোঝা যাচ্ছে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে তার।

—কাজটা তাহলে আপনিই করলেন?

—কোন কাজটা?

—ওই যে মোড়ল শিকদারের কোনো কারণ ছাড়াই হঠাত্ চলে যাওয়াটা।

—জি।

—কিভাবে করলেন?

বদি মাস্টার হাসে, আসলে আমি খবর পাইছি আগেই। মোড়ল শিকদার কী কিসিমের লোক আমিতো জানি। ওর লোকের গায়ে হাত দিছেন, ওর গায়ে হাত দিছেন, তারপরও কি ওরা আপনেরে ছাইড়া দিবে? ওদের ওপর নজর রাখলাম। ওরা যখন দলবল নিয়া জিনের হ্রদের দিকে রওনা করল তখন দুইয়ে দুইয়ে পাঁচ মিলাইলাম আরকি!

—দুইয়ে দুইয়ে পাঁচ!

—বুঝলেন না? এইটা আমার নিজস্ব হিসাব। দুইয়ে দুইয়ে চাইরতো সবাই জানি। এক রাখছি সম্ভাবনার কথা ভাইবা, ধ্রুবকও বলতে পারেন। হাসে বদি মাস্টার। তারপর হঠাত্ গম্ভীর হয়ে যায়, ফিস ফিস করে বলে, মোড়ল শিকদারের মাথা আউলাইয়া দিছি.. তার দিক থাইকা কোনো ভয় নাই আর। তারপরও আমি কই কী, আপনি গা ঢাকা দেন... এইখান থাইকা চইলা যান।

— না না, আমার বিষয়টা জানতে হবে আর এই বাচ্চাটাকেও আমি সঙ্গে নিতে চাই।

—কেন? ওরে নিবেন কেন?

—ওর মাথার যন্ত্রণার ব্যাপারটা ঢাকায় চিকিৎসা করা দরকার। ও বলেছে ওর নাকি মাঝে মাঝেই যন্ত্রণাটা হয়।

—না না ওর মাথায় কোনো সমস্যা নাই।

—আপনি কিভাবে জানেন?

—আমি জানি। ... তাহলে বলি শোনেন। আমি ওরে ব্যবহার করি মাঝে মধ্যে...

—মানে?

—মানে ধরেন, মানুষের ব্রেনতো একটা নিউট্রাল নেটওয়ার্ক... একটা কম্পিউটার... এমন একটা কম্পিউটার যার ডাটা আমরা ইচ্ছা করলেই বের করে আনতে পারি না।

আদনান শাফি অবাক হয়ে শুনে গ্রামের একটা স্কুলের কম্পিউটার শিক্ষকের ব্যাখ্যা... কিন্তু আমি একটা বুদ্ধি বের করছি..

—কী রকম?

—আমি ছোটবেলায় ঢাকায় পড়াশোনা করছি। বাবা ছিল কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার মেকানিক। তারে হেল্প করতাম। তার কারণে কম্পিউটার নিয়া অনেক কিছু শিখছি। হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার দুইটাই বুঝি। তারপর বাবা মারা গেল। ঢাকা শহরে টিকতে পারলাম না, চলে এলাম গ্রামে... সে অনেক কাহিনি, সেই কাহিনিতে গেলাম না। তো যেটা আপনেরে বলছিলাম...

আদনান খেয়াল করে দূরে ধুলো উড়িয়ে ছুটে আসছে সালু... ছেলেটা অসম্ভব দুরন্ত... আজ ক দিন ধরে আদনানের পিছে পিছেই আছে।

—মানুষের মাথা মানে মগজ হচ্ছে প্রত্যেকটা বিচ্ছিন্ন কম্পিউটার। একটার সাথে আরেকটার যোগাযোগ করা যায় না। তবে আমি একটা বুদ্ধি বের করেছি যোগাযোগের।

—সেই বুদ্ধিটা কী?

—মানুষের শরীরে একটা বিশেষ ভাইরাস আছে, সবার শরীরে এটা অবশ্য থাকে না। ভাইরাসটার অদ্ভুত নাম হচ্ছে থ্রিটুফাইজ। এই ভাইরাসটা ব্যাকটেরিয়ার ভেতর ঢুকে তাকে ধ্বংস করে নিজের আরো কয়েকটা কপি তৈরি করে বের হয়ে আসে। ভাইরাসটা দেখতেও ম্যাকানিকাল স্ট্রাকচারের।

—আপনি কম্পিউটারের লোক, ভাইরাস নিয়ে এত খবর জানলেন কিভাবে?

—কম্পিউটার আমার ফাস্ট চয়েজ সেকেন্ড চয়েজ মাইক্রোবায়োলজি..।

—ইন্টারেস্টিং।

—তো যা বলছিলাম... আমি করলাম কি ওই ভাইরাসটার একটা কপি তৈরি করলাম কম্পিউটারের জন্য, সাইবার কপি বলতে পারেন... তখনই ইন্টারেস্টিং ঘটনাটা ঘটল...

—কী ঘটনা?

—মানুষের ভাইরাসের সঙ্গে কম্পিউটার ভাইরাসের একটা যোগাযোগ হলো.. আমি এখন যেকোনো মানুষের মাথার ডাটা নিয়ে আসতে পারি। ডাটা এলোমেলো করে দিতে পারি... অনেকটা হ্যাকাররা যেমন কোনো ওয়েবসাইটে ঢুকে ডাটা তছনছ করে সব ধ্বংস করে দেয় সেইরকম আরকি।

—তার মানে এভাবেই আপনি শিকদার মোড়লকে ধ্বংস করেছেন, মানে পাগল বানিয়ে দিয়েছেন?

—জি। এর জন্য আমার মোডেম লাগে। আমার মোডেম হচ্ছে এই সালু।

সালু ততক্ষণে এসে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে হাসিমুখে। সালুর উপস্থিতির কারণেই কি না কে জানে বদি মাস্টার গলা নামিয়ে ফিস ফিস করে বলে, সালুর শরীরে এই ভাইরাসটা আছে। আমি ওরে ব্যবহার করি।

—এই কারণে ওর মাথায় যন্ত্রণা হয়?

—হ্যাঁ...

—সে জানে আপনার কারণে তার মাথায় এই যন্ত্রণা হয়?

—জানে।

—সে কেন রাজি হয় এই যন্ত্রণাটা নিতে?

হেসে ওঠে বদি মাস্টার। চলেন স্যার, আগে চা খাই। সালু, যা চা আন জামাইয়ের দোকান থাইকা... কবি চিনি কম লিকার চা। দুইটা সিঙ্গারা আনিস। তোর লাইগাও একটা আনিস।

—আইচ্ছা। যেন এই হুকুমটার জন্য অপেক্ষা করছিল সে, ছুটে বের হয়ে গেল সালু।

—তাহলে স্যার মজার একটা পরীক্ষার কথা বলি। রাশিয়ার একজন বিজ্ঞানী একবার মজার একটা পরীক্ষা করছিলেন তার কুকুরকে নিয়া। বিজ্ঞানীর নাম ইভান পাভলভ। পরোক্ষ আর প্রত্যক্ষ এই দুটো ব্যাপারকে সমন্বয় করার একটা পরীক্ষা বলতে পারেন। পরীক্ষাটাকে বলে ক্লাসিক্যাল কন্ডিশনিং..

সালু চা নিয়ে এসেছে। দক্ষ হতে চা-সিঙ্গারা পরিবেশনে লেগে গেছে দেখে মনে হচ্ছে, এ কাজ তাকে মাঝে মাঝেই করতে হয় এখানে।

—পাভলভ করলেন কী, তার নিজের কুকুরটাকে একটা বন্ধ অন্ধকার ঘরে আটকে রাখলেন। তারপর তাকে খাবার দেয়ার আগে লাইট জ্বালালেন। এভাবে প্রতিবারই কুকুরটাকে খাবার দেবার আগে লাইট জ্বালালেন। এবং খুব শিগ্রি তিনি আবিষ্কার করলেন, লাইট জ্বালালেই কুকুরটার মুখে লালা

আসে, তাকে খাবার দিতে হয় না। এখানে খাবারের কারণে কুকুরের মুখে লালা আসে—এটা হচ্ছে প্রত্যক্ষ কারণ আর লাইট জ্বালানো ছিল পরোক্ষ কারণ... কিন্তু দেখুন, তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষকে কী সুন্দরভাবে সমন্বয় করেছেন...

—এই পরীক্ষার সঙ্গে সালুর যন্ত্রণা নেয়ার কারণ কী?

—ছেলেটা স্যার ছোট বলে তাকে ব্যবহার করতে দেয় না... তখন আমি একটা কৌশল করি

—কী কৌশল?

—ক্লাসিক্যাল কন্ডিশনিং।

—কিভাবে?

—ওকে প্রথমে একটা যন্ত্রণা দেই প্রচণ্ড যন্ত্রণা... কয়েক মুহূর্তের জন্য, তারপরই আমি প্রচণ্ড আনন্দ দেই। এখন সে ওই আনন্দটার জন্য সে এই যন্ত্রণাটা নিতে চায়...এবং

তারপরই আমি তাকে মোডেম হিসেবে ব্যবহার করি।

—বলেন কী? এটাতো খুব খারাপ... একটা বাচ্চা ছেলেকে আপনি ব্যবহার করছেন।

—স্যার আপনি ভুলে যাচ্ছেন ওকে ব্যবহার করেই আমি আপনাকে বাঁচিয়েছি ওকেও বাঁচিয়েছি... শুধু তাই না, এই গ্রামকেই আমি মোড়ল শিকদারের হাত থেকে বাঁচিয়েছি।

—সেটা ঠিক তারপরও আমি বলব... এটা উচিত্ না একটা বাচ্চাকে...

—আসলে কি স্যার, আমি আর ওকে ব্যবহার করব না। এতদিন করছিলাম ওই... ভাইরাসটা সালুর শরীরে পাচ্ছিলাম আর কারো শরীরে পাচ্ছিলাম না.. তবে মনে হচ্ছে আরেকজনের শরীরে পেয়েছি..

—কে সে?

জবাব দেয় না বদি মাস্টার, মিটি মিটি হাসে। আর হঠাত্ তীব্র একটা যন্ত্রণা শুরু হয় আদনান শাফির মাথায়... তার চোখের সামনে দপ দপ করছে একটা হলুদ পর্দা...!

বদি মাস্টারের একটা হাত ততক্ষণে... অস্থির একটা মাকড়শার মতো ছুটে বেড়াচ্ছে তার ল্যাপটপের কি-বোর্ডের ওপর.. সালুও অবাক হয়ে পুরো বিষয়টা দেখছে।

এত রাতে হবীব বা পারভিন জেগে থাকবে আদনান শাফি ভাবেনি। টানা দু দিন পর আদনান হবীবদের ঘরে ফিরল। হবীবের মুখ যথেষ্ট গম্ভীর। আদনান হাসির চেষ্টা করল।

—তোর সমস্যা করলাম?

—তুই এখনো বেঁচে আছিস ভেবে আমি অবাক হচ্ছি।

—হ্যাঁ বেঁচে আছি বৈকি।

—তুই আসার পর থেকে এই গ্রামে অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটছে।

—যেমন?

—যেমন মোড়ল শিকদার পাগল হয়ে গেছে। তাকে তার আত্মীয়স্বজন নাকি ঘরে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছে।

—আর কী?

—আরগুলো বলতে চাচ্ছি না। তুই আজ রাতের বাসেই চলে যা.. আই রিক্যুয়েস্ট...

—ভাইজান... পাশ থেকে পারভিন কিছু বলতে চায় মনে হলো।

—হ্যাঁ তাই যাব, সেই জন্যেই এসেছি।

—তোর ব্যাগ গোছানো আছে... পারভিন? অর্থাত্ পারভীন আদনান সাফির ব্যাগটা নিয়ে আস। আদনান কিছু না বলে পুকুর ঘাটের দিকে রওনা দেয়। কোথায় যাচ্ছিস? হবীব হঠাত্ চেঁচিয়ে ওঠে। এবার তার গলায় স্পষ্ট ক্ষোভ যেন।

—কী আশ্চর্য হবীব, আমি কি একটু হাতমুখ ধুয়েও যেতে পারব না? পুকুর পার থেকে আসি।

পুকুর পাড়টায় যতবার আসে আদনান প্রতিবারই নতুন নতুন করে অসাধারণ লাগে। মুখ ধুতে গিয়েও পানিতে হাত দেয় না। কী শান্ত হয়ে আছে পুকুরটা, তার ওপর চাঁদের শান্ত প্রতিবিম্ব, হাত দিলেই চাঁদটা ভেঙে যাবে। তারপরও হাত দেয়... আদনান, মাথাটা ধোয়া দরকার। বদি মাস্টার কি সালুর মতো তাকেও ব্যবহার করল? মাথার ভেতর কোথাও ঝা ঝা একটা শব্দ হচ্ছে। আকাশের দিকে তাকায়। আজও আকাশে ঝকঝক করছে শত শত তারা। টেলিস্কোপটা বের করাই হলো না। কিছুই হচ্ছে না প্ল্যানমাফিক।

হাতমুখ ধুয়ে উঠে দাঁড়াতেই দেখে দাঁড়িয়ে আছে পারভিন।

—তুমি?

—ভাইজান, আমি আপনের সাথে যামু।

—কোথায়?

—আপনি যেইখানে নিবেন। হঠাত্ আদনান শাফির একটা হাত চেপে ধরে একটা গাছের আড়ালে নিয়ে যায় পারভিন। আদনান আশ্চর্য হয়ে দেখে পারভিন কাঁদছে। সে প্রায় সেঁটে আছে তার গায়ের সঙ্গে। একটা গাঢ় রমণীয় ঘ্রাণ।

—কী হলো তোমার?

—আ-আমি আপনার সঙ্গে যাব। এই খানে হবীব ভাই আমারে.. কথা শেষ করে না পারভিন। হঠাত্ আদনানের হাত ছেড়ে ছুটে পালিয়ে যায়। আদনান অবাক হয়ে দেখে, খুব কাছেই দাঁড়িয়ে আছে হবীব। তার হাতে একটা দোনলা বন্দুক। অবাক হয় আদনান। সে এখানে কখন এল? নাকি আগে থেকেই এখানে ছিল!

—কী ব্যাপার হবীব, তোর হাতে বন্দুক?

—তুই এক্ষণ এ বাড়ি থেকে যাবি।

—তা যাচ্ছি... কিন্তু পারভিনের কী হয়েছে?

—ইউ গেট লস্ট! প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে হবীব।

হবীবের বাসা থেকে আদনান বের হওয়ার পর। একটা গুলির শব্দ শুনল। গুলিটা হবীবের হাতের বন্দুকের? সে কাকে গুলি করল? পারভিনকে ? না-ও হতে পারে। তারপরও থমকে দাঁড়াল আদনান... ঠিক তখনই তার মাথায় যন্ত্রণা শুরু হলো। প্রচণ্ড যন্ত্রণা। চোখের সামনে একটা ধূসর দেয়াল কেঁপে উঠল। তারপর ধূসর দেয়ালটা আস্তে আস্তে হলুদ হতে থাকল... আদনান কাঁধের ব্যাগটা ফেলে দু হাতে খামছে ধরল সামনের কড়ই গাছটা।

কড়ই গাছটা অবশ্য তার যন্ত্রণার কোনো উপশম করতে পারল না।

—আচ্ছা মিলি, তুমি কিন্তু তোমার সেই আদনানকে নিয়ে আর কিছু বললে না?

—কী বলব?

—বাহ তুমি জান না ওই গ্রামটায় আমি গিয়েছিলাম। গোবিন্দপুর গ্রাম। একটা জিওলজিক্যাল সার্ভের কাজে। ওখানে একটা হ্রদ আছে.. হ্রদের ভেতরে একটা গেইসারের মতো আছে, এলাকার লোকজন অবশ্য জানে না। আমরা পয়েন্ট আউট করে এসেছি।

—গেইসার কী?

—মিথেন গ্যাস বের হয়ে আসে মাটির নিচ থেকে। এরকম একটা গেইসারের সন্ধান পেয়েছিলাম আমরা চট্টগ্রামের বাড়বকুণ্ডে আর পেলাম এখানে।

—গেইসারের সুবিধা কী?

—সুবিধা আর কী একটা ডিফারেন্ট ন্যাচারেল ফিচার!...তো ওই গেইসার সন্ধান করতে গিয়েই হঠাত্ তোমার শাফিকে দেখলাম..

—কিভাবে চিনলে? তুমিতো শাফিকে কখনো দেখনি।

—লোকজন বলে দিল এই লোকের নাম শাফি, ঢাকা থেকে এসে...

—ঢাকা থেকে এসে? থামলে কেন?

—থাক, আমার মনে হয় তোমার না শোনাই ভালো। বিষয়টা আমারও ভালো লাগেনি।

—কেন কী হয়েছে? বলো না?

আন্দালিব দুঃখিত ভঙ্গিতে তাকায় মিলির দিকে। মাথা নাড়ে তারপর নরম গলায় বলে—

—সে বাজারের ভেতর ঘুরে বেড়াচ্ছিল... ইয়ে সম্পূর্ণ উলঙ্গ। গায়ে একটা সুতাও নেই।

—মানে? কেন?

—মানে... হি ওয়াজ কমপ্লিটলি ম্যাড...

—তাই নাকি?

মিলি অবাক হয়ে তাকায়। তারপর কল্পনায় দেখার চেষ্টা করে তার খুব পরিচিত একজন লম্বা চুলের পুরুষ উলঙ্গ ঘুরে বেড়াচ্ছে গ্রামের বাজারে। সবাই ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখছে! কেউ হয়তো হাসছে পাগলের কাণ্ড দেখে। গলার কাছে মিলি বেদনা বোধ করে। নিজেকে হঠাত্ কোনো কারণ ছাড়াই অপরাধী লাগে... মানব জীবন কত বিচিত্র!

এই ঘটনার বহু বছর পর। যখন সালু প্রায় তরুণ। আর বদি মাস্টার প্রবীণ এক রিটায়ার্ড শিক্ষক তখন আবারও তারা মুখোমুখি হলো একদিন সেই জিনের হদে... সেই জিনের হ্রদ আগের মতোই আছে, বদলে গেছে শুধু আশপাশের সাধারণ মানুষগুলো।

—ও স্যার?

—বল?

—একটা কথা জিগাইতাম?

—জিগা?

—মোড়ল শিকদাররে মনে আছে?

—আছে।

—সে নাকি গতকাল মরছে। শেষের দিকে তারে শিকল দিয়া বাইন্দা রাখতে হইত...

জিভে চুক চুক শব্দ করে হাসে বদি মাস্টার। এরেই কয় নিয়তি.. বুঝলি?

—ও স্যার?

—ক।

—স্যার, ওরেতো আপনি পাগল বানাইছিলেন... মনে আছে?

—হু... তো?

—কিন্তু আদনান স্যাররে পাগল বানাইছিলেন কেন? সেতো ভালো মানুষ ছিল।

—খুব খারাপ মানুষের যেমন দরকার নাই সেই রকম খুব ভালো মানুষেরও দরকার নাইরে সালু।

—কেন?

—এইডা আমার হিসাব... দুইয়ে দুইয়ে পাঁচ... খুব ভালো মানুষ দেখবি কিছু করতে পারে না। ভালো কিছু করতে হইলে নিয়ম ভাঙতে হয়, ভালো মানুষ নিয়ম ভাঙতে ভয় পায়... তারা ভাবে, নিয়ম ভাঙলে মানুষ কষ্ট পাইব দরকার কী?

—ভুল কথা। অবাক হয়ে তাকায় বদি মাস্টার। সালু এখন ছাত্র। অনার্স শেষ করে দর্শনে মাস্টার্স করছে ময়মনসিংহ আনন্দমোহন বিশ্ববিদ্যালয়ে। তার চোখে মুখে অন্যরকম একটা দ্যুতি। কিংবা কে জানে এই জিনের হদের ঢিবিতে বসে আছে বলে তাকে অন্যরকম লাগে। তার ওপর চাঁদের একপেশে আলো এসে পড়েছে।

—তোর হিসাবটা শুনি?

ওপরের দিকে তাকায় সালু। সেই ছোটবেলায় যেমনটা তাকাতো। সবাই বলতো ছোড়া, আকাশে কী খোঁজে। সালু ফিস ফিস করে বলে, ও স্যার, আপনার হিসাব ভুল... কিছু ভালো মানুষ পৃথিবীতে থাকতেই হইব সবসময়.. নইলে পৃথিবীটা এখনো আছে কিভাবে কন?

বদি মাস্টার কথা বলে না। তারা দু জনেই তাকিয়ে দেখে, কে একজন দ্রুত পায়ে হেঁটে আসছে। চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় বোঝা যায় লোকটা উলঙ্গ। মাথাভরতি চুল-দাড়ির জঙ্গল... গোবিন্দপুর গ্রামের পরিচিত পাগল.. শাফি পাগল। সে সালু আর বদি মাস্টারকে উপেক্ষা করে সোজা এসে দাঁড়ায় জিনের হদের সবচে উঁচু ধারটায়। এভাবে দাঁড়ানোটা ঝুঁকিপূর্ণ, যদি পাড়টা ভেঙে নিচে পড়ে যায়। সালু একবার ভাবে, ছুটে গিয়ে ধরবে... কিন্তু ধরে না। তার কাছে লাগে একটা অপার্থিব দৃশ্য... উলঙ্গ মানুষ চাঁদ আর জিনের হ্রদের অসাধারণ এক গ্রাফিক্স। আর তখনই ঝুপ করে একটা শব্দ হয়। হা হা করে ছুটে আসে বদি মাস্টার, সালু ধর ধর ওতো পড়ে গেল! সালু মূর্তির মতো বসে থাকে নড়ে না।

...এক সময় সালু উঁকি মারে নিচে, হাত দুটি ছড়িয়ে পানিতে চিত্ হয়ে ভাসছে আদনান শাফি... সালুর কাছে লাগে যিশুখৃষ্ট যেন ক্রুশবিদ্ধ হয়ে পানিতে ভাসছেন! ওপরে তাকিয়ে দেখে, বদি মাস্টার হাঁটুতে দুই হাত দিয়ে কেমন এক ভঙ্গিতে বসা ...হঠাত্ দেখলে মনে হয় যেন মহামতি বুদ্ধ বসে আছেন...! সালুর নিজেকে খুব অসহায় লাগে! তাহলে সে কে? ...তার ভেতরে যেন কেউ ফিস ফিস করে বলে, তুমি অন্য কেউ... সব মানুষই আসলে অন্য কেউ!

শেষ

এই পিডিএফটি তৈরি করেছেন BIRONJEET ROY

বইয়ের পোকা ♦ (The INSECT of books) এর সৌজন্যে।

এধরণের আরও পিডিএফ পেতে ভিসিট করুন

banglapdf.net।

আর বইসংক্রান্ত যে কোন আলোচনার জন্য জয়েন করুন

বইয়ের পোকা ♦ (The INSECT of books) গ্রুপে। এই গ্রুপ শুধুমাত্র বইপ্রেমী মানুষের জন্য। আপনার পড়া বই সম্পর্কিত কোন তথ্য এই গ্রুপে দিতে পারেন। অথবা কোন বইয়ের পিডিএফ লিঙ্ক, রিভিউ-ও দিতে পারেন এখানে। বর্তমানে পাঠক-লেখকদের এক আশ্চর্য মিলনস্থলে পরিণত হয়েছে এই গ্রুপ। একইসাথে ঘুরে আসুন banglapdf সাইটের গ্রুপ BanglaPDF.net (বাংলাপিডিএফ.নেট) এ।

বিঃদ্র- পিডিএফটি আপনারা যেখানে খুশি, যতবার খুশি শেয়ার করতে পারেন, আমার কোন আপত্তি নেই। তবে কার্তেসি দিলে ভাল হয়, না দিলেও আমার কিছু বলার নেই। শুধু নিজেদের নামে চালিয়ে দিয়েন না।